মননমধু

শ্রীশ্রীমা ও যোগমায়া

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক

সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বৈতসত্তা। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি কারণ, সেটি কারও কার্য নয়, তাই প্রধান। প্রকৃতি থেকে প্রকৃতি-বিকৃতি, তারপর বিকৃতি। প্রকৃতি-বিকৃতি কার্য এবং কারণ দুইই, আর বিকৃতি কার্য। পুরুষ হল প্রকৃতি-বিকৃতি-শূন্য। প্রকৃতি, মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার, পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই চব্বিশটি সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব। প্রকৃতি-বিকৃতি-শূন্য, যা প্রকৃতি নয় আবার তার কার্য বা বিকারও নয়, তা হল পুরুষ। এদুটির সম্মিলন বিনা জগৎ সৃষ্টি হয় না। ''পঙ্গবন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃর্তঃ সর্গঃ'' (সাংখ্যকারিকা ২১)—পঙ্গু ও অন্ধের মতন পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে এ-জগতের সৃষ্টি। ভাবার্থ—পঙ্গু চলতে পারে না, অন্ধ চলতে পারে কিন্তু দৃষ্টিশক্তি না থাকায় নিয়ন্ত্রণহীন; তাই পঙ্গু যদি অন্ধের পিঠে বসে তাহলে দুজনের মিলিত প্রয়াসে পথ চলা সম্ভব হয়। স্তোত্রে শ্রীমাকে বলা হয়েছে 'প্রকৃতিং পরমাম্'—তিনি পরমা প্রকৃতি। আর শ্রীরামকৃষ্ণকে ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে 'প্রকৃতি-বিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্তিং' অর্থাৎ তিনি প্রকৃতিবিকৃতিশূন্য আদি পুরুষ। তিনি কারণাতীত হয়েও শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে যুগ্মতায় জগৎসৃষ্টির নিমিত্তকারণ এবং তাঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে সৃষ্ট এই রামকৃষ্ণ জগৎ।

এই স্থূল জগতের মধ্যে রামকৃষ্ণ ভাবজগত নির্মাণে এক অতুল শক্তির প্রয়োজন ছিল, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা ও শ্রীমায়ের শক্তি মিলিত হয়ে এক প্রবল ইচ্ছাশক্তিরূপে প্রকাশ পাবে। সেই ইচ্ছাশক্তিই শ্রীশ্রীমায়ের প্রার্থনার ধারা বেয়ে আজকের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। দক্ষিণেশ্বরে এক ফলহারিণী কালীপূজার রাতে ষোড়শীপূজার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরে সে-শক্তির উদ্বোধন ঘটালেন এবং সে-শক্তির বিকাশে শ্রীশ্রীমা নীরব

সাধনে মগ্ন রইলেন। কিছুকাল পরে ত্যাগী ভক্তদের আগমন হলে, সেই উদ্বোধিত শক্তির বিকিরণের মাধ্যম হিসাবে ঠাকুর ত্যাগী সন্তানদের তৈরি করতে লাগলেন। তখনও তাঁর উদ্দেশ্য সম্যক কারও উপলব্ধি হয়নি। কাশীপুরে শেষশয্যায় তিনি দেখছিলেন যে ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীমা তাঁর ত্যাগী সন্তানদের জননী হয়ে উঠছেন, যার শুরু হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে তাদের খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে। তাঁর স্থূল অদর্শনের আগে যেমন নরেনকে অন্য ভাইদের একসঙ্গে রাখার ভার দিয়ে গেলেন, সেইসঙ্গে শ্রীশ্রীমাকেও বলে গেলেন—তাঁকে এরা যেমন করেছে ঠিক তেমনই মাকেও করবে। অর্থাৎ শুধু সেবা করবে তাই নয়, যেভাবে এরা তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁর পথনির্দেশ গ্রহণ করছে, সেভাবে ভবিষ্যতে তারা মায়ের কাছেও পথনির্দেশ চাইবে। হয়তো এ-গুরুদায়িত্ব বুঝতে পেরেই মা একবার বলেছিলেন, ‘‘আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?’’ কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সেকথাকে গুরুত্ব না দিয়ে বলেছিলেন, ‘‘না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।’’

নরেনের মতো শ্রীমাকেও গড়ে তুলতে ঠাকুর যা যা করেছিলেন ও বলেছিলেন তার বেশিরভাগই আমাদের অজানা। তবে মাকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করেই যে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেছিলেন এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর অদর্শনের পর পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল। সবরকমে শ্রীরামকৃষ্ণনির্ভর বালকেরা দিশেহারা। শ্রীশ্রীমা তখনও প্রায় অসূর্যম্পশ্যা। বয়স্ক গৃহী ভক্তেরা ঠাকুরের আগমনের উদ্দেশ্য সম্যক বুঝতে না পেরে দিশাহীন। ফলে আংশিকভাবে হলেও তাঁরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে ব্যগ্র; তাই বালকদের সংসারে ফিরে যাওয়ার উপদেশই দিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনা ও উদ্দেশ্য তো কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট ভক্তের জন্য ছিল না, তাই তিনি তাঁর রসদ্দার সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে দর্শন দিয়ে বললেন বালক ভক্তদের সংসারের বাইরে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। শুরু হল বরানগর মঠ—এক ভাঙা পোড়ো বাড়িতে। চরম দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তাকে বালক ভক্তেরা তাঁদের চরম ত্যাগ ও তপস্যা দিয়ে ঢেকে দিতে চাইলেন। শ্রীশ্রীমাও তখন বৃন্দাবনে, শ্রীরামকৃষ্ণকে হারানোর শোককে শ্রীরাধার বিরহে পরিণত করে তপস্যায় ডুবে আছেন। এই সময়টি যেন ত্যাগ ও তপস্যার উত্তাপে ও প্রেমের রসে রামকৃষ্ণ-জগতের বীজটিকে জারিত করার সময়। তার অঙ্কুর বেরোল বৃন্দাবনেই, যখন শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে শ্রীশ্রীমা যোগানন্দকে দীক্ষা দিলেন আর তাঁর কৃপাশক্তির উদ্বোধন ঘটল।

কিন্তু সে-পর্যন্তই, শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীরামকৃষ্ণে নিমগ্ন মন এ-জগতে নামতে চাইল না। কামারপুকুরে ফিরে আত্মীয়দের চরম অবহেলা তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। নানাবিধ দর্শন হতে লাগল। এক গেরুয়াধারিণী সন্ন্যাসিনীকে সদাই তাঁর সঙ্গে ঘুরতে দেখতে থাকলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দর্শন দিয়ে পঞ্চতপা করতে বললেন, সদা তপস্যা-উন্মুখ তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করার জন্য। তখনই তার সুযোগ না ঘটায় আবার দর্শন দিলেন একটি বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে, বললেন, ‘‘এটি যোগমায়া, একে আশ্রয় করে থাক।’’ শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিস্থ মন সত্ত্বগুণী নরেন প্রমুখ কয়েকটি বাছাই ভক্তদের ওপর নামিয়ে রাখার সুযোগ ছিল। তিনি বাস করতেন দেবালয়ের পবিত্র পরিবেশে, বিষয়ী লোকেদের থেকে তফাতে। প্রতাপ হাজরার টিপ্পনি ছিল, ভগবানকে ছেড়ে বালকদের ওপর মন রাখা! তাতে চিন্তিত ঠাকুর তাঁর ‘মা’কে তো জিজ্ঞাসা করলেনই, আবার ভোলা মুহুরিকেও জিজ্ঞাসা করলেন। ভোলানাথ মহাভারত উদ্ধৃত করে বললেন যে সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এসে সত্ত্বগুণী ভক্ত না পেলে মন রাখবেন কোথায়! শ্রীরামকৃষ্ণের

যে-সুযোগ ছিল তা শ্রীমায়ের জন্য বরাদ্দ ছিল না। ঠাকুর তাঁকে মাটির কাছাকাছি নয়, এ-পৃথিবীর ধুলোয়, মালিন্যে, জগতের ঘোর বিষয়ী মানুষদের মধ্যে রেখে জগৎসৃষ্টিরূপ কার্য করবেন। ত্যাগী ভক্তেরা শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান হলেও তাঁদের থেকে বাহ্য দূরত্বে তাঁর অবস্থান, অতএব এই যোগমায়ার অবতারণা, যে-বালিকা তার মায়াশক্তিবলে শ্রীশ্রীমায়ের মনকে এ-জগতে যুক্ত করে রাখবে। কিন্তু তার প্রস্তুতি চলেছিল বেশ কিছুদিন ধরে।

কামারপুকুরে শ্রীশ্রীমার অবস্থান নিরাসক্তি, নির্বাসনার এক দুর্লভ প্রকাশ। মাকে নিজের ভিটেতে থাকার অনুরোধ জানিয়ে ঠাকুর ভাইপো রামলালকে বলেছিলেন, ‘‘দ্যাখ, তোর খুড়ি যেন কামারপুকুরে থাকে।’’ তিনি উত্তর দেন, ‘‘ওঁর যেখানে ইচ্ছা হবে সেখানে থাকবেন।’’ এর তাৎপর্য বুঝে ঠাকুর ভর্ৎসনা করে বলেন, ‘‘সে কি রে? তুই পুরুষ মানুষ হয়েছিস কি জন্য?’’ কিন্তু রামলালদাদা ঠাকুরের কথা পালন করা বা মায়ের গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব নেওয়া তো দূরের কথা, কামারপুকুরে মায়ের থাকায় ভীষণ বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। এমনকী ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের মাসিক সাত টাকা অনুদান যা তিনি শ্রীশ্রীমাকে দিতেন, তাও বন্ধ করিয়ে দেন। কিন্তু মায়ের নিরন্তর ঊর্ধ্বগামী মনকে তা বিশেষ স্পর্শ করেনি। এই মন খানিক নিম্নগামী হল সন্তানদের ডাকে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে অবস্থান করার সময়। এখানেই মা পঞ্চতপা অনুষ্ঠান করলেন ও তাঁর তীব্র বৈরাগ্যপ্রবণ মন একটু নিচে নেমে এল। এরপর কামারপুকুরে তাঁর বাসের সময় আত্মীয়স্বজনের তীব্র অবহেলা, চরম দারিদ্র্য দেখে শ্যামাসুন্দরী দেবী তাঁর কন্যাকে জয়রামবাটীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে শ্রীশ্রীমা একদিন দেখেন যে তাঁর মৃত ছোটভাইয়ের পাগল স্ত্রী কতগুলি কাঁথা বগলে যাচ্ছে আর পিছনে তার শিশুকন্যাটি হামা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে। মায়ের বাৎসল্য উথলে উঠল। ছুটে গিয়ে তাকে কোলে নিতেই ঠাকুর আবির্ভূত হয়ে বললেন, ‘‘এটি যোগমায়া, একে আশ্রয় করে থাকো।’’ এ-ই রাধারানি—মায়ের রাধু।

শিশু রাধুর সমস্ত ভার শ্রীশ্রীমায়ের ওপর। বস্তুত কেবল মাতৃনির্ভর শিশু তীব্র বাৎসল্যের আকর্ষণে জননীর মনকে যেভাবে তার মধ্যেই ব্যস্ত রাখে, আর কোনও সম্পর্ক তা করতে পারে না। এই শিশু রাধুকে নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের মন খানিক সংসারে এল। তাও কতটা! স্বামী তুরীয়ানন্দজী বলতেন যে তাঁরা বহু তপস্যার বলে যেখানে অর্থাৎ কণ্ঠে মনকে ওঠাতে চেষ্টা করেন, মা সেখানে বহু কষ্টে মনকে নামিয়ে রেখেছেন। সেখান থেকে মা এই জগতকে দেখতেন বলেই তাঁর মাতৃভাবে কোনও বাছবিচার ছিল না। শুধু তাই নয়, জগদ্‌বাসীর কার কী প্রয়োজন, কাকে কী দিতে হবে, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন তিনি।

একান্ত মাতৃনির্ভর, আপাত পরিকল্পনাহীন শ্রীরামকৃষ্ণের কী নিখুঁত পরিকল্পনা ছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর ত্যাগী ও গৃহী সন্তানেরা জয়রামবাটীতে এসে মাঝে মাঝে মাতৃস্নেহসুধা পান করে যেতে লাগলেন। তখনকার জয়রামবাটী অতি দুর্গম, কিন্তু সে-কষ্ট ভক্তেরা অবহেলায় উপেক্ষা করতে লাগলেন। কৃপাবন্যা শুরু হল। কিন্তু আশ্চর্য, সে-কৃপা গুরু-শিষ্য সম্পর্কে হলেও শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে দেখিয়ে বলতেন, উনিই গুরু, উনিই ইষ্ট। প্রশ্ন উঠত, তাহলে তিনি কে? শ্রীশ্রীমা বলতেন, আমি তোমাদের মা। এ এক সর্বগ্রাসী মাতৃত্বের সম্পর্ক, যে-সম্পর্ক সমস্ত সম্পর্ককে আত্মসাৎ করার ক্ষমতা রাখে। সেখানে গুরুর প্রতি সমীহ, শ্রদ্ধার দূরত্ব ঘুচে যায়, থাকে শুধু মা আর ছেলের মধুর আনন্দবন্ধন। তাঁর নরেনই তাঁকে বুঝেছিলেন, তাই আমেরিকা থেকে চিঠিতে লিখলেন ভাইদের : ‘‘মা-ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে

পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে।" তাঁকে বুঝতে ত্যাগী সন্তানদেরই অনেকদিন লেগেছিল, অন্যদের আর কী কথা! মা তাঁদের ভুলিয়ে রেখেছিলেন। অবশ্য কোন ছেলেই বা মাকে বুঝতে চায়! সে স্নেহ আস্বাদনেই মত্ত থাকে। শুরু হল শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবজগৎ নির্মাণ, এক অভূতপূর্ব স্নেহমধুরতার মধ্য দিয়ে। নির্মাণকর্মের যে-নিয়মশৃঙ্খলা মানুষকে কঠোর কর্তব্যে নিয়োজিত করে, সে-শুষ্কতার পরিবর্তে সেটি অদ্ভুত মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল। তাঁর সেবক সন্ন্যাসিবৃন্দ ও গৃহী ভক্তদের স্মৃতিতে তা ধরা আছে লিখিতরূপে।

রাধু বড় হয়, তার স্বভাবেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ভক্তরা অবাক হয়ে দেখেন যে মায়ের পূর্ণ স্নেহসান্নিধ্যে থেকেও এ-মেয়ে কেমন অবুঝ, আবদেরে, জেদি ও একরোখা। শ্রীশ্রীমা, অসুবিধা ও কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাকে প্রশ্রয় দেন। সেবক ও ভক্তেরা তার অমার্জিত আচরণে বিরক্ত বোধ করেন। কিন্তু এর কোনও গূঢ় কারণ কারও চোখে পড়ে না, পড়া সম্ভবও নয়। শ্রীশ্রীমা সংসারের সমস্ত কাজ করেন, সন্তানদের সেবা করেন, তারা তাঁর স্নেহে অভিভূত, মায়ের মন কোথায় ক্ষণে ক্ষণে উঠে যায় তার খবর কে রাখে! সেবক সন্ন্যাসীদের স্মৃতিতে তার কিছু কিছু ধরা আছে। সারদেশানন্দজী তুলে ধরেছেন একটি ছবি। সন্ধ্যার পর মা জয়রামবাটীতে মাটির দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে আছেন, পাশে ছেলেদের রাতের খাবার ঢাকা দেওয়া। গ্রাম্য রাতের নৈঃশব্দ্যে কেবল ঝিঁঝি পোকার ডাক। সেবক দেখছেন লণ্ঠনের মৃদু আলোয় অর্ধসমাহিত মাতৃমূর্তিকে। শরীরকে এখানে রেখে মায়ের মন কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে! সন্তান আশুতোষ মিত্র লিখছেন কোঠারে এক দুপুরের কথা। নিস্তব্ধ দুপুরে খিড়কিদুয়ারে শ্রীশ্রীমা বসে। আশুবাবু এলেও মা আত্মমগ্ন, প্রায় দশ মিনিট পর যেন বহুদূর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কখন এলে?" তারপর যেন অস্ফুট স্বরে এক অন্য জগতের খবর দিতে লাগলেন—"বারবার আসা, বিরাম নেই, শিব শক্তি একত্রে।"

কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের রাধুকে অতিরিক্ত প্রশ্রয়, তার প্রতি বাৎসল্যের প্রবল আকর্ষণ বেশিরভাগ ভক্তের মনেই প্রশ্ন, সন্দেহ জাগায়। এক মহিলা বলেই ফেললেন, "আপনি দেখছি ঘোর মায়ায় বদ্ধ।" মা হেসে উত্তর দিলেন : "কী করব মা, নিজেই মায়া।" ভক্তটি কথাটি বুঝতে পারলেন কী না বলা মুশকিল। স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজী একদিন তো প্রায় তিরস্কারের স্বরে বলে উঠলেন, "মা আপনি দিনরাত কেবল রাধু রাধু করছেন, এত ভক্ত আসছে তাদের দিকে আপনার লক্ষ্য নেই, এত আসক্তি কি ভাল?" শ্রীশ্রীমা সাধারণত এ-ধরনের প্রশ্নের মামুলি উত্তর দিতেন, কিন্তু সেদিন বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, "তুমি এরকম কোথায় পাবে? আমার মতো একটি বের কর দেখি? কি জান, যারা পরমার্থ খুব চিন্তা করে, তাদের মন খুব সূক্ষ্ম, শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই মন যা ধরে, সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে। তাই আসক্তির মতো মনে হয়।" আসলে আসক্তিহীন না হলে নিরাসক্তের এ-রূপটি বোঝা অসম্ভব।

রাধু যত বড় হয়, মায়ের প্রতি তার অত্যাচারের মাত্রাও বাড়ে, যার মধ্যে শারীরিক পীড়নও পড়ে। কখনও পা দিয়ে, কখনও ঝুড়ি থেকে বেগুন তুলে ছুঁড়ে মারে। মা তার মাথায় নিজের পায়ের ধুলো দিয়ে ঠাকুরের কাছে তার দোষ ক্ষমা করতে প্রার্থনা জানান। এসবের অর্থ বোঝা সত্যিই মুশকিল। তবে এটি সময়োচিত ব্যবহার হয়তো। কারণ ঠাকুর যখন দীর্ঘ ছমাস নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে আছেন তখন কোথা থেকে এক সাধু আসেন। তিনি রুল দিয়ে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করে করে তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করতেন যাতে মুখে একটু আহার গুঁজে দিতে পারেন, কারণ তিনি জানতেন যে ওই শরীর দিয়ে জগতের অনেক কাজ হবে। কে জানে এটি

তুলনীয় কী না। তবে এটি যে আসক্তি ছিল না তা বুঝতে মায়ের শেষশয্যা অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছিল ভক্তদের। শেষসময়ে মা যখন নিস্পৃহকণ্ঠে রাধু ও তার শিশু সন্তানকে জয়রামবাটীতে পাঠিয়ে দিতে বলে বললেন যে সব মায়া কাটিয়ে দিয়েছেন, তখন স্বামী সারদানন্দজী হতাশ স্বরে বললেন, ''তবে আর মাকে রাখা গেল না। রাধুর উপর থেকে যখন মন তুলে নিয়েছেন, তখন আর আশা নেই।''

এই অদ্ভুত বিরাগ আর আসক্তির বিরল সমাহারকে লক্ষ করেই সারদানন্দজী শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরুদ্ধ হয়ে গেয়েছিলেন : ''রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর অবাক হয়েছি/ হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবতেছি/ বিচিত্র এই ভবের খেলা/ ভাঙা গড়া দুটি বেলা/ ঠিক যেন এক ছেলেখেলা বুঝতে পেরেছি/ এতকাল রইলাম কাছে/ ফিরিলাম পাছে পাছে/ কিছু বুঝিতে না পেরে শেষে হার মেনেছি।''

স্বামীজী সঙ্ঘ স্থাপন করে মাকে সঙ্ঘজননী বলে নির্দেশ করলেন, কিন্তু যোগানন্দজী মায়ের শরীররক্ষার কারণে তাঁকে জনসমক্ষে আনতে বারণ করলেন। শ্রীশ্রীমাকে অন্তরালেই রাখা ঠিক হল। তাঁরা মায়ের কথা সাধারণে প্রচার করা থেকে বিরত রইলেন। কিন্তু মায়ের স্নেহে ধন্য ভক্তদের মুখে মুখে তাঁর অপার্থিব করুণার কথা ছড়াতে শুরু করল। শ্রীরামকৃষ্ণের জগৎ নির্মাণের ভার যে তাঁর ওপর! তাই ঘোর বিষয়ী ভাইয়েরা, সংকীর্ণমনা সমাজপতির দল, রাধু, মাকু, নলিনীদিদি ও পাগলিমামির পরস্পরের ঝগড়া—এসবের মধ্যে অদ্ভুত নির্লিপ্ততায় শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা রয়েছে সকলের ওপর; হিন্দু মুসলমান, খ্রিস্টান, পারসি বাদ যায়নি কেউ। স্থূলদেহে যতটা করেছেন তার বহুগুণ করছেন এখন সূক্ষ্মদেহে, আমরা পৃথিবীর কোণে কোণে তাঁর সচিত্র উপস্থিতি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হচ্ছি। এর পিছনে কিন্তু আমাদের চোখে রাধুর বিরক্তিকর উপস্থিতি। তার বিরক্তি উৎপাদন ক্রিয়াই যে মায়ের মনকে এ-জগতে নামিয়ে রেখে জগৎকল্যাণে প্রবৃত্ত করে রেখেছিল এটি এখন বেশ বোঝা যায়। তাই আজ রামকৃষ্ণভক্তদের মনে রাধুর শত দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা অবশ্যই থাকার কথা।

আগ্রহী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে, মায়ের অদর্শনের পর রাধুর কী হল। শ্রীশ্রীমায়ের শেষ অসুখে রাধু ক্রুদ্ধস্বরে তাঁর মৃত্যুকামনা করে গালাগালি দিচ্ছিল। এই একবারই শ্রীশ্রীমায়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হতে দেখি। মা বললেন, ''হ্যাঁ, টের পাবি আমি মলে তোর দশা কি হয়।... তুই আগে মর, তারপর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।'' কথায় আছে মায়ের অভিশাপ সন্তানের লাগে না। কিন্তু শরীরের কর্মফল তো থাকেই। শ্রীশ্রীমায়ের অদর্শনের পর রাধু প্রথমে জয়রামবাটীতে মায়ের দেওয়া ঘরটিতে ও তারপর স্বামী মন্মথের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি তাজপুর চলে আসে। মন্মথ গ্রাম্য জমিদারের ছেলে; তাস খেলে, তামাক খেয়ে আলস্যে দিন কাটাতে অভ্যস্ত। শ্রীশ্রীমা তাকে রেলে একটি চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন কিন্তু সে তা করেনি। মায়ের সংসারে থাকায় অর্থের অনটন কাকে বলে সে বোঝেনি। তাদের জমিদারির পড়ন্ত অবস্থা ক্রমশ দুরবস্থায় পরিণত হয়। বাঁকুড়ার বিভূতিবাবু খবর পেয়ে তাকে সেখানে একটি বইয়ের দোকান করে দেন কিন্তু চিরকালের অকর্মণ্য মন্মথ সেটিও চালাতে পারেনি। এখন পারিবারিক দুরবস্থায় তার অক্ষমতা রাধুর প্রতি দুর্ব্যবহারে প্রকাশ পেতে থাকে। রাধুকে নিত্য গালিগালাজ, প্রহারে নির্যাতিত, অতিষ্ঠ করে তুলতে থাকে সে। রাধু চোখের জলে চিঠি লেখে মায়ের সন্তান বাঁকুড়ার বিভূতি ঘোষকে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বিভূতিবাবু কিশোরী মহারাজের (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) সঙ্গে পরামর্শ করে, এটি শ্বশুরবাড়ি-না-করা রাধুর প্রাথমিক সমস্যা ভেবে

কোনও ব্যবস্থা নেননি। ইতোমধ্যে মন্মথ রাধুর বর্তমানেই হিরণ্ময়ী বলে একটি মেয়েকে বিয়ে করে আনে। চিরকাল মায়ের আদরে লালিত রাধু মায়ের অভাবে দিশাহারা। আবার চিঠি লেখে বিভূতিবাবুকে। এই দ্বিতীয় চিঠিতে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার আকুল প্রার্থনা দেখে বিভূতিবাবু দ্বিধা কাটিয়ে তাকে জয়রামবাটীতে নিয়ে আসেন। স্বামী সারদানন্দ তার মাসোহারার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রাধুর রেহাই ছিল না। নির্লজ্জ মন্মথ টাকার দরকার পড়লেই রাধুর কাছে এসে তার টাকায় ভাগ বসাত ও কদিন কাটিয়ে যেত। রাধু তাকে কিছু বলতে পারত না। রাধুর ছেলেটি মারা যাওয়ার পর এখানে তার একটি কন্যাসন্তান হয়। নির্মলা নামের সেই কন্যাটিকে পরবর্তী কালে কিশোরী মহারাজ নিবেদিতা স্কুলে রেখে মানুষ করেন ও বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন।

রাধু বেশ কিছুকাল পরে অসুস্থ হয়—জ্বর ও প্রবল কাশি। কিশোরী মহারাজ নিবেদিতা স্কুলে পাঠান চিকিৎসার জন্য। সেখানে ধরা পড়ে তার মারণ ক্ষয়রোগ। আত্মবোধানন্দজী কাশী সেবাশ্রমে পাঠাতে চাইলেন তাকে। আত্মপ্রকাশানন্দজী কাশীতে আশ্রমের পাশেই একটি বাড়ি ভাড়া করে তাকে বরদা মহারাজকে দিয়ে কাশী আনান ও চিকিৎসা শুরু করেন। মায়ের সেবিকা সরলা দেবী (ভারতীপ্রাণা-মাতাজী) তখন কাশীতে, তিনি তার সেবার ভার নেন। কিন্তু কদিন থাকার পরই রাধু জয়রামবাটী ফেরার জন্য জেদ করতে থাকে। বরদা মহারাজ নিজের রিটার্ন টিকিট কেটে গিয়েছিলেন। ফেরার আগের দিন তিনি রাধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে সে আবার জয়রামবাটী ফিরে যাওয়ার জন্য জেদ করতে থাকে। নানাভাবে বোঝালেও সে শুনতে রাজি নয়। বরদা মহারাজ বলেন, সে সেরে উঠলেই তাকে জয়রামবাটী নিয়ে যাওয়া হবে। তখন সে তীব্র স্বরে বলে ওঠে : ‘‘আমি জানি আমার যক্ষ্মা হয়েছে যাতে কেউ বাঁচে না। তোমরা চাও যে কাশীতে মরে আমার মুক্তি হয়। গোপালদা, এতদিন মায়ের কাছে থেকে তোমার এই বুদ্ধি! মা আমার জন্ম থেকে আমার জন্য এত করেছেন, জয়রামবাটীতে ঘর রেখে গেছেন, আর এটুকু করেননি? আমার সমস্ত ভার তিনি নিয়েছেন। মুক্তি আমার হাতের মুঠোয়, আমি আস্তাকুঁড়ে পড়ে মরলেও আমার মুক্তি হবে, তোমাকে তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।” সেই স্থির বিশ্বাসের কথা শুনে প্রিয় মহারাজের চোখে জল আর বরদা মহারাজ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বস্তুত রাধু তখন মা ছাড়া কিছু জানে না। ভারতীপ্রাণামাতাজী পরে উষারানি দেবীকে বলেছিলেন, ‘‘এ তো হবারই ছিল। রাধু এসেছিলই সংসারে মায়ের মনকে নামিয়ে রাখতে। তার অভিনয়ের পালা শেষ। এখন মা ছাড়া তার ভাবনাতে কেই বা থাকবে।”

জয়রামবাটীতে রাধু তার নিজের ঘরটিতে ফিরে এল। যোগমায়ারূপে তার নির্ধারিত কর্ম ও তার ভোগ শেষ করে ২৩ নভেম্বর ১৯৪০ সকাল নটায় চল্লিশ বছর বয়সে সজ্ঞানে মায়ের নাম করতে করতে শ্রীমায়ের পাদপদ্মে মিশে গেল সে। রাধু শ্রীরামকৃষ্ণ-জগৎ নির্মাণে যোগমায়ারূপে মায়ের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে রইল চিরকালের জন্য।

সহায়ক গ্রন্থ

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১২

২। রাধুর শেষদিনগুলির জন্য : Swami Chetanananda, *Sri Sarada Devi and Her Divine Play*, Vedanta Society of St. Louis, 2015, p. 762-772